বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ৩০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৯

বিশ্বায়ন, দরিদ্রতা এবং বাংলাদেশ

আবদুল বায়েস*
মাহবুব হোসেন**
ফারহানা সেহরীন***

১। হোটেল এবং হতাশা

ম্যানহাটান ছায়াছবিতে উডি এ্যালেনের চরিত্রটি নাকি একটা হোটেলে ঢুকে ভয়ানক পঁচা খাবারের সন্ধান পায়। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকাবার পর ভ্রূকুঞ্চিত উডি এ্যালেন বিড়বিড় করে বলে: তাওতো দেখছি খুব বেশি নেই। অর্থাৎ পঁচা খাবার যদি বেশি থাকতো, উডি এ্যালেনের হয়তো মন্দ লাগতো না। মনে হয়, বহুজাতিক কোম্পানি ও বিশ্বায়ন বিরোধীদের অবস্থান অনেকটা উডি এ্যালেন চরিত্রের মতোই। একদিকে বলা হচ্ছে যে, বিশ্বায়ন গরিব দেশের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে, অপরদিকে যোগ করা হচ্ছে যে উন্নত দেশগুলো নানা বাহানায় অনুন্নত দেশের পণ্যের প্রবেশগম্যতা সীমাবদ্ধ করে রাখছে। কিংবা অভিযোগটা এরকম যে, অনুন্নত দেশের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও 'অনিষ্টকারক' বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ঐসব দেশে যেতে চায় না। আবার এমনও দেখা গেছে, পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিগুলোর বেশির ভাগ আবেগ-তাড়িত অথবা শুধুমাত্র রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোকে প্রতিষ্ঠিত। তবে সবচাইতে বিপজ্জনক বিচ্যুতি হচ্ছে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের অবমূল্যায়ন করার কাজটি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের প্রতি উদাসীনতা এবং যথাযথ পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভালাভের হিসাবের প্রকট অনুপস্থিতি শুধু বেদনাদায়ক নয়, বড় ধরনের বিপত্তিরও উৎস হতে পারে। এ নিয়ে অনেক ঘটনার কথা উলেণ্টখ করা যায়, তবে খুব সংক্ষেপে একটি ঘটনার কথা বলতে হচ্ছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসো মিতেরার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি জেকস আটালি। অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। বইয়ের তাক সমেত এক দেয়ালের সামনে দাঁড়ানো মিতেরাকে একবার এক ফরাসি টেলিভিশন থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: এই যে এতো বই আপনার শেলফে, তার মধ্যে অর্থনীতির কোনো বই কি আছে? মিতেরা তাঁর বক্ষ:স্থল সামনে বাড়িয়ে না রাখার আনন্দে বলেছেন: একটিও না। এবং তার কয়েক সপ্তাহ পরেই ফ্রান্স এক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। কারো কারো মতে, অর্থনীতি একজন গৃহিণীর মতো, তাঁকে অবজ্ঞা করা মানে নিজেকে বিপদগ্রস্ড় করা। সম্ভবত অর্থনৈতিক সূত্রগুলোকে অবজ্ঞা করার কারণে জ্যামাইকার মেনেলি, ঘানার নক্রুমা, মিসরের নাসের এবং ইন্দোনেশিয়ার সোয়েফান প্রমুখ বড় মাপের দেশপ্রেমিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাদের বাম-ঘেষা অর্থনৈতিক নীতিমালা সফল হয়নি। সুতরাং বিশ্বায়নকে দেখতে হবে অর্থনীতির দৃষ্টিতে (ভগবতি ২০০৪)। যাক সে কথা। আমরা সবাই জানি যে, বৈশ্বিকরণ বা বিশ্বায়নের স্ড়র ও মাত্রা অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং আমরা এও জানি যে, অর্থনৈতিক অর্থতার সুযোগে দেশগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে আসতে শুরু করেছে। বিশ্বায়নের এ প্রবণতা নতুন কোনো ঘটনা নয়; এমন কি শত বছর পূর্বেও জাতিগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক যোগসূত্রতার কথা শোনা যায়, যদিও তা বর্তমানের মতো এতো গভীর ও বহুমুখী ছিল না। সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম দুটি প্রধান নিয়ামক হিসেবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্য প্রাক্কলন ও পরিমাপ প্রয়োজন। বিশেষ করে

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
** নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক।
*** প্রভাষক ,মার্কেটিং বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ২০১৫ অর্থবছরের মধ্যে গড়ে বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রত্যাশিত মাত্রা অর্জন করা একান্ড় প্রয়োজন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১১-২০১৫) প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৫ অর্থবছরে বিনিয়োগের হার প্রয়োজন জিডিপি'র ৩২.৫ শতাংশ, যা বর্তমানে মাত্র ২৫ শতাংশ।

উদাহরণস্বরূপ, অতীতের তুলনায় ইদানীং অপ্রত্যাশিতভাবে পণ্য ও আর্থিক বাজারে সংযোগ বেড়ে চলেছে (সম্ভবত বর্তমানে ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থান করছে)। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আগের চাইতে বর্তমানে পুঁজি ও পণ্য বাজার অধিকতর বেগবান হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আরও তিনটি কারণে বর্তমান বিশ্বায়ন ১০০ বছরের আগের বিশ্বায়নের চাইতে ভিন্নতর: বাণিজ্যকৃত পণ্য উৎপাদনের একটা বড় অংশ আন্ড়র্জাতিক বাজারে প্রবেশ করছে, সেবামূলক পণ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং উৎপাদন ও বিশেষ করে বাণিজ্যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর উপস্থিতি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানির আগমন প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ১০০ বছর কেন ৩০০ বছর পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনকে ভারত আবিষ্কারের পথ সুপথ দিয়েছিল। অন্যদিকে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন্দোনেশিয়াতে প্রবলভাবে প্রভাব রেখেছিল। যা হোক, সংযোগকে আগের চাইতে আরও ব্যয়-সাশ্রয়ী করার জন্য ইতোমধ্যে পরিবহন খরচ ব্যাপকভাবে কমে যেতে শুর" করেছে। যেমন, নিউয়ইয়র্ক থেকে লন্ডনে তিন মিনিটের টেলিফোন কল চার্জ ১৯৩০ সালের ২৩০ ডলার থেকে কমে বর্তমানে কয়েক সেন্টসে দাঁড়িয়েছে। ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংস্থার সংখ্যা ১৯৮৬ সালের ৫,০০০ থেকে বেড়ে বর্তমানে কয়েক কোটি হয়েছে (ভগবতি ২০০৪)। এর পেছনে কাজ করেছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বিশেষ করে বিমান ও জাহাজ পরিবহণ ক্ষেত্রে সাধিত অভূতপূর্ব অগ্রগতি। সুতরাং বিশ্বায়নের কারণে শুধু আন্ড়:দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে না, সে বাণিজ্য আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রবৃদ্ধির উপর বাণিজ্যের প্রভাব পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থনৈতিকভাবে অর্থবোধক হয়ে উঠছে এই অর্থে যে, যদি বাণিজ্য জিডিপির অনুপাত ২০ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়, তাহলে প্রতি বছর প্রবৃদ্ধি বাড়ে ০.৫-১ পয়েন্ট (বোরদো ও অন্যান্য ২০০৯)। হেকসার-ওহলিন তত্ত্ব অনুযায়ী বাণিজ্যের ফলে শ্রমের দাম বৃদ্ধি পায় এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপটে আমদানি উদারিকরণের উপকরণের প্রান্ড়িক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় (পিটলাক ২০০৬)।

২। বিশ্বায়ন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী

বিশ্বায়ন দরিদ্রদের জন্য আর্শীবাদ না অভিশাপ এ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি আজ সর্বত্র আলোচিত। যারা বিশ্বায়নকে অভিশাপ হিসেবে দেখে, তাদের যুক্তিগুলো মোটেও অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কথা ধরা যাক। জলবায়ু পরিবর্তনকে বিশ্বায়নের একটা বিরূপ প্রভাবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে নাকি ১০ শতাংশ উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, যার মানে প্রায় ৪০ লাখ মেট্রিক টন (বাজার মূল্য ২৫০ কোটি ডলার বা জিডিপির ২-৩ শতাংশ) খাদ্য উৎপাদন কমে যায় (প্রথম আলো, ১৩ আগস্ট ২০১২)। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কেউ যদি বিশ্বায়নের বির"দ্ধে অবস্থান নিয়ে তাকে কি দোষ দেয়া যায়? তবে বিশ্বায়ন নিয়ে উন্নত ও অনুন্নত উভয় বিশ্বেই প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো, এমনকি ধনী বিশ্বেরও কেউ কেউ মনে করে যে বৈশ্বিকরণের ফলে ধনী দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে। যেমন, অনুন্নত বিশ্বে সস্ড়া শ্রমে তৈরি পণ্যের প্রবাহ তাদের আপেক্ষিক সুবিধাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বলা হচ্ছে যে, তাদের দেশের অদক্ষ শ্রমিকরা চাকরি হারাতে বসেছে। যুক্তিতর্ক শেষে কথা একটাই, আর তা হচ্ছে বৈশ্বিকরণ ক্রমবর্ধমানভাবে গ্রাস করছে গরিবদেরকে। সুতরাং মূল কথা হলো বিশ্বায়ন থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। এর বিপরীতে বিশ্বায়নের সমর্থকদের যুক্তি হচ্ছে, দেশগুলোর মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান যোগাযোগের কারণে, বিশেষ করে চীন ও ভিয়েতনামে, দারিদ্র্য ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। ইউরোপের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ট্রেনে উঠে নিজেদের আয় বৃদ্ধির, সামর্থ্য অর্জন করেছে এবং আফ্রিকা মহাদেশের কিছু দেশের জন্যও তা আশার আলো দেখাতে শুর" করেছে। তবে এটা সত্য যে, যদিও বিশ্ববাজারের বিস্তৃতি উন্নয়নশীল দেশের জন্যে ভালো করার প্রতিশ্র"তি দিচ্ছে কিন্তু যে সমস্ড় নিয়মকানুন বা বিধিনিষেধ পেড়িয়ে উন্নত দেশের বাজারে প্রবেশ করতে হয় তাতে সে উদ্দেশ্য তো সফলতা পায় না, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন রডরিক (২০০২): "Caught between WTO requirements, World Bank Strictures, IMF conditions and the need to maintain the confidence of financial markets, developing countries are increasingly deprived of the room they need to devise their own paths out of poverty"। অর্থাৎ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চাহিদা, বিশ্বব্যাংকের কঠোর নিয়মানুবর্তিতামূলক নির্দেশ, আইএমএফ-এর শর্ত, এবং অর্থবাজারের আস্থা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা এ সকল বহুমুখী বেড়াজালে পড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো দারিদ্র্য থেকে বেড়িয়ে আসবার জন্যে তাদের নিজস্ব পথ ও পাথেয় প্রণয়ন করার অবকাশ থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে, বৈশ্বিকরণের বির"দ্ধে যুক্তিগুলো সমস্যা সমাধানে দরিদ্র দেশের অসামর্থতা এবং অনেক ক্ষেত্রে দাতা দেশগুলোর ভুল উপদেশে নিহিত। এর ফলে কেন্দ্রে থাকা (Center) ও কেন্দ্র থেকে দূরে থাকা (Periphery) দেশগুলোরে মধ্যকার ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে, আমরা মনে করি উন্নয়নশীল দেশের গরিবদের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব মূল্যায়নে যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ বিশ্বায়ন যেমন বহুবিধ, তেমনি দরিদ্র মানুষও কোনো সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়। লিঙ্গ, অঞ্চল, পেশা, জমির মালিকানা, বাসস্থান, শিক্ষা, অবকাঠামোগত সুযোগ এবং এমনকি পরিধেয় বা পোশাক পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকট বিভাজন লক্ষ করা যায়। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, বিশ্বায়ন বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব ফেলবে। আবার বিশ্বায়নের কোনো একটা উপাদান উপকারি হলেও অন্যটি অপকারিও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন একমাত্রিক কোনো ধারণা নয়। বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বৈশ্বিকরণ প্রবাহিত যেমন, বাণিজ্য, অর্থ, সংস্কৃতি, প্রযুক্তিগত সেবা ইত্যাদি। অধিকন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, এমনকি অর্থনৈতিক দিক থেকেও বিশ্বায়নের বহু মাত্রা রয়েছে—বাণিজ্য, দীর্ঘমেয়াদি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, স্বল্পকালীন পোর্টফোলিও বিনিয়োগ প্রবাহ ইত্যাদি। আবার এর সাথে আছে বৈধ ও অবৈধ অভিবাসন এবং প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়র। এগুলো সাংস্কৃতিক বা যোগাযোগজনিত বিশ্বায়ন থেকে আলাদা প্রভাব নিয়ে হাজির হয়, যদিও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত এবং যোগাযোগজনিত বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে গভীরতর করে (ভগবতি ২০০৪)।

সবশেষে দেশ-ভিত্তিক রিগ্রেশন থেকে এ যাবৎ সাধারণভাবে যে মন্ড়ব্যগুলো এসেছে তা নিতান্ড়ই বিশ্বায়ন ও দারিদ্র্যের মধ্যকার অনুবন্ধ (Correlation), কার্যকর অনুঘটক নয় (Causation)। বিশ্বায়নবাদীরা মনে করে, সাম্প্রতিককালের ব্যাপক অর্থনৈতিক অখ"তার ফলে চীন ও ভারতে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশ কমেছে। কিন্তু এর পেছনে যে অভ্যন্ড়রীণ বিভিন্ন উপাদান যেমন অবকাঠামোর বিস্ড়ৃতি অথবা ১৯৭৮ সালের বড়মাপের ভূমিসংস্কার, পলণ্টী থেকে নগরে অভিবাসনের উপর

বিধিনিষেধ শিথিলকরণ, সবুজ বিপণ্ডব, সামাজিক আন্দোলন কিংবা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (বিশেষ করে ভারতে) বড় ভূমিকা রাখেনি সেটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। অন্যদিকে বিশ্বায়ন বিরোধীদের বক্তব্য হচ্ছে, একই শতাব্দিতে সাব-সাহারা আফ্রিকায় কোনো উন্নয়ন ঘটেনি বরং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে এর পেছনে বিশ্বায়নের কোনো প্রভাব নেই, প্রভাব আছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অস্থিতিশীলতা অথবা ব্যর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার যেসব কারণে বিশ্বায়নের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে (বর্ধন ২০০৪)। এটা সত্য যে, সব ক্ষেত্রেই বৈষম্য, ক্ষমতায়নের পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতি সংকট অবিশ্বাস সৃষ্টি করে চলেছে, তবে এর সাথে ঠিক কোন অংশটি দরিদ্রদের বাঁচার বির"দ্ধে কাজ করছে তা শনাক্ত করা কঠিন কাজ। তৃতীয়ত, বৈশ্বিকরণ ও দারিদ্র্য উভয় যদি বহুমাত্রিক হয়, তা হলে তাদের মধ্যকার সংযোগটিও বহুমাত্রিক থেকে যাচ্ছে। যেমন, মানব সূচকের মাত্রায় একটা দেশের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা ও অপুষ্টির মাত্রায় সে দেশটির অবনতি হতে পারে। সুতরাং বিশ্বায়নের মূল্যায়ন যেমন আলো থেকে অন্ধকারে পতিত হবার কথা বলে, আবার একই সাথে অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তরণের গল্পও শোনায়।

৩। বিশ্বায়ন ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এবং দারিদ্র্য কমাতে সাহায্য করে তা স্বীকার করে নিলেও বিশ্বায়ন এবং রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মান-এর মধ্যকার যোগসূত্রতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের ভক্তদের মতে, অবাধ বাণিজ্য ও পুঁজিপ্রবাহ প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা অর্জনে সহায়তা দিয়েছে, যার ফলে একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণি লাভবান হয়েছে তেমনি অন্যদিকে তার সাথে রাজনৈতিক অধিকার, গণতন্ত্র ও সুশাসনের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্ড়রে বিশ্বায়ন বিরোধীদের বক্তব্য হচ্ছে, বিশ্বায়ন দারিদ্র্যের প্রকোপ ও আয় বৈষম্য বাড়ায়, সংকট সৃষ্টি করে এবং সমাজের একটা অংশের হাতে ক্ষমতা পুঞ্জিভূত করে অন্য অংশকে দুর্বল করার ক্ষেত্র তৈরি করে। এর ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা হুমকির মুখে পড়ে।

প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ দেখায় যে, বিশ্বায়নের ফলে ক্রমবর্ধমান তথ্য প্রবাহ ও যোগাযোগের কারণে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র উৎসাহিত হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এ প্রত্যাশা তৈরি হয় যে, গণতন্ত্রায়নের দিকে যাবার প্রবণতা দুর্নীতি ও সহচারিতার (cronyism) উপর চাপ সৃষ্টি করবে, নাগরিক সমাজের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে এবং আইনের শাসনের উপর অব্যাহত চাপ সৃষ্টি করবে। এ সবই দরিদ্রদের জন্য উপযোগী কারণ তারাই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত মুক্ত সংবাদ প্রবাহ বিশিষ্ট স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে তেমন বিপর্যয়কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি। মোট কথা, প্রত্যেক সমাজেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকলে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণি জন্ম নেয় যারা পর্যায়ক্রমে রাজনীতিতে গণতন্ত্রায়নের কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি করে। এই নতুন বুর্জুয়া গোষ্ঠী একটু মোটা মানিব্যাগ পকেটে নিয়ে শুধুমাত্র পণ্যের বাজারে নয়, রাজনীতির বাজারেও প্রভাব ফেলতে চায়। ভ্রমণ, ভিডিও, রেডিও ও টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে ইদানীং এই শ্রেণি বিশ্বের অন্যান্য সমাজের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। আর গণতন্ত্রের উপস্থিতিতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা কম থাকার কথা ইতিপূর্বে অমর্ত্য সেন বলেছেন। যেমন বলা হচ্ছে গণতন্ত্র থাকলে শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা হ্রাস পায় (ভগবতি ২০০৪, সেন ১৯৯৯, ১৯৮৪, স্মিথ ও হাদ্দাদ ২০০০)। যাহোক, বিশ্বায়নের বিপক্ষে অন্যতম জোরালো যুক্তি এই যে, বিশ্বায়ন প্রথাগত মূল্যবোধকে খর্ব করে, অধিকন্তু বিশ্বায়ন প্রসূত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নগরায়ন সৃষ্টি করে ও গ্রামীণ সমাজকে অবজ্ঞা করে। এক্ষেত্রে বিশ্বায়নের গতিশীলতা অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ: অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে বিশ্বায়ন

হওয়া মানে প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ও প্রচলিত মূল্যবোধ খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজনের সুযোগ পায় (স্টিগলিটজ ২০০৩)।

৪। বাংলাদেশ ও বিশ্বায়ন

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর বিশ্বায়নের প্রভাব মূল্যায়নের আগে আর একটা বিষয় পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। আর তাহলো শুধুমাত্র বাণিজ্য উদারীকরণের ক্ষেত্রে (যা বিশ্বায়নের একটা অন্যতম উপাদান) বাংলাদেশ বেশ কিছুটা এগোতে পেরেছে, ফলে মোট আমদানি ও রপ্তানি মূল্যের অংশ জিডিপিতে ৪০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। নব্বই দশকের আগ পর্যন্ড় যা ছিল ২০-২৫ ভাগ। তবে বিদেশি বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করা হলে (যা বিশ্বায়নের অন্যতম স্ড়ম্ভ) চিত্রটি তখন বেশ হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশে বছরে গড়ে ১ বিলিয়ন ডলারের মতো বিদেশি বিনিয়োগ আসে, যা ভারত, ভিয়েতনাম ও চীনের তুলনায় অত্যন্ড় কম। এদেশে পোর্টফোলিও বিনিয়োগের আগমন এক প্রকার নেই বললেই চলে। অন্যদিকে প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে ইন্টারনেটের সুযোগ লভ্যতা বোধ করি পৃথিবীতে সর্ব নিম্নে; মেয়াদি পুঁজি প্রবাহের পরিমাণ তেমন উলেণ্ডখযোগ্য নয়। বস্তুত সার্বিক অর্থে বিশ্বায়ন বলতে যা নির্দেশ করে বাংলাদেশ সে রকম বিশ্বায়নের মুখোমুখী এখনো হতে পারেনি। এমনকি বিশ্বায়নের সুযোগের মাপকাঠিতে এবং তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান বেশ নিচের দিকে। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থান সূচকের সর্বনিম্নের এক-তৃতীয়াংশ দেশের মধ্যে (ইসলাম ২০০৪)। তারপরও বিশ্বায়নের অন্যতম দু'টো গুর"ত্বপূর্ণ উপাদান যথা বাণিজ্য উদারীকরণ এবং প্রযুক্তিগত প্রবাহের প্রভাব নিয়ে দু'একটা কথা বলা যেতে পারে।

৫। বিশ্বায়নের প্রভাব

৫.১। অস্পষ্ট প্রভাব

শুর"তেই বাংলাদেশের চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা ধরা যাক। এ গোষ্ঠীর এমন কিছু পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য আছে যে কারণে তাদের দুর্ভোগের জন্যে বিশ্বায়নকে তেমন একটা দায়ী করা যায় না। এ ধরনের দরিদ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ খানার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এবং এসব খানায় প্রায় ৩ কোটি মানুষ বাস করে (এর মধ্যে হত-দরিদ্রদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি)। তাদের জীবন-জীবিকার দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এদের দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ড় নগণ্য; দৈনিক কায়িক শ্রমে সংসার চলে (কৃষি, অকৃষি বা অন্যের বাড়িতে কাজ করা); জন্ম নেয়া শিশুদের প্রায় অর্ধেক প্রথম বছরেই মারা যায় এবং প্রতিকূল পরিবেশ কিংবা অবকাঠামোগতভাবে দুর্বল অঞ্চলে বাস করে বলে অর্থনৈতিক কর্মকা"ে তাদের তেমন অংশগ্রহণ নেই। এক অর্থে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের ফাঁদে অবস্থান করে যেখানে দারিদ্র্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্ড়র স্থানান্ড়রীত হয়। তাদের অনেকে আবার দীর্ঘস্থায়ী দরিদ্র। এ গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো কোনো খানার দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ ১,৮০৫ কিলো ক্যালরী (অর্থাৎ ২,১২২ ক্যালরীর ৮৫ শতাংশ) আবার কোনো কোনো খানায় ১,৬০০ কিলো ক্যালরী (অবিমিশ্র দরিদ্র রেখার ৭৫ শতাংশ)। এরা তাদের মোট অর্জিত আয়ের ৬০-৭০ ভাগ ব্যয় করে খাদ্য ক্রয়ে (বিশেষ করে দেশে উৎপাদিত মোটা চাল) এবং বাকী ৪০-৩০ ভাগ ব্যয় করে দেশীয় উপকরণ ও উৎপাদনে।

বক্স ১ : আবেগ এবং বুদ্ধি (Hearts and Heads)

ইউরোপের অনেক পুরাতন একটা বচন এরকম: ৩০ বছর বয়সের পূর্বে যদি কেউ সমাজতন্ত্রী না হয় তখন বুঝতে হবে ব্যক্তিটির আবেগ বলে কিছু নেই। আর ৩০ বছর পার হবার পরও যদি সে সমাজতন্ত্রী থাকে, তখন বুঝতে হবে তার বুদ্ধি বলে কিছু নেই। সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠা বৈশ্বিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ওই বচনটি একটু ঘুরিয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে। বৈশ্বিকরণের ফলে যা ঘটছে তার সবটাই সুন্দর এবং সমর্থনযোগ্য এমনটি ভাবার অবকাশ নেই। আপনি যদি তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের পণ্য ক্রয় করেন, তো নিশ্চিত জানবেন এটা তারাই তৈরি করেছে যাদের মজুরি পশ্চিমা প্রেক্ষিতে খুবই কম, এবং সম্ভবত ভয়ানক পরিবেশে তৈরি হয়েছে। এরকম বিষয়গুলো যাদেরকে অন্তত কিছু সময় চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন করে না, বলতে হবে তাদের হৃদয় বলে কিছু নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য সঠিক। বরং যারা মনে করে বিশ্ব দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের উত্তর হচ্ছে শুধুমাত্র বিশ্ব বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার, তাদের বুদ্ধি নেই অথবা বুদ্ধি থাকলেও তা খাটাতে পছন্দ করে না। বিশ্বায়ন বিরোধীরা কাজের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করছে বেশি যাদের ব্যাপারে তারা সচরাচর সোচ্চার। একটা শিশু ঘর্মশালায় (Sweatshop) কাজ করছে এর চাইতে বেদনাদায়ক দৃশ্য আর কি হতে পারে? ১৯৯৩ সালের কথা। বাংলাদেশের শিশু শ্রমিক ওয়ালমার্টের জন্যে কাপড় তৈরি করছে এবং সিনেটর টম হারকিন কম-বয়স্ক কর্মীদের ব্যবহারকারী অঞ্চল থেকে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করায় প্রস্তাব পেশ করলেন। এর প্রত্যক্ষ ফল হলো এই যে, বাংলাদেশে বস্ত্র কারখানাগুলো শিশু শ্রমিক নেয়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু চাকরি হারানো ওই শিশুগুলো কি স্কুলে গিয়েছে? বরং চাকরিচ্যুত শিশুরা আরও বিরূপ পরিবেশে কাজ করছে অথবা রাস্তায় পড়ে থাকছে, এবং তাদের উলেণ্টখযোগ্য অংশ পতিতালয়ে প্রবেশ করেছে। সুতরাং কারা মন্দ লোক? কুইবেক শহরে আন্দোলনরত বিশ্বায়ন বিরোধী কর্মীরা এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে, নেতারা নিরাপত্তার দুর্গে বসে আছেন আর হাজার হাজার পুলিশ বাইরে থাকা বিরোধীদের থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে ব্যস্ত। কিন্তু প্রতিচ্ছবি অনেক সময় প্রতারণা করতে পারে। শক্ত বেড়া দিয়ে ঘেরা দুর্গের ভেতরে যারা অবস্থান করছেন তাদের অনেকে বিশ্বের দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, আর মনে হয় বেড়ার বাইরে পথ আটকে বসে থাকা আন্দোলনরতদের, তাদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক, সর্বপ্রচেষ্টা চলছে দরিদ্রকে দরিদ্রতর করার জন্যে।

উৎস: Paul Krugman, The New York Times, April 22, 2001।

এ প্রেক্ষিতে সম্ভবত মনে করা যায় যে, বৈশ্বিকরণের ঢেউ এই গোষ্ঠীর তীরে এসে পৌঁছতে পারে না যদি না বিশ্বায়নের প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের যে অভিযোগ একটু আগে উলেণ্টখ করা হয়েছে তা সত্যি সত্যি ঘটে থাকে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং দেশীয় উৎপাদনের ব্যাপক হ্রাস যখন খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়, তখন খাদ্যদ্রব্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তাদেরকে আঘাত করতে পারে। পূর্বেই উলেণ্টখ করা হয়েছে, এই জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, বস্ত্র ও খাবার-দাবার মূলত দেশজ দ্রব্যে তৈরি। তাদের মূল সমস্যা সম্পদের স্বল্পতা। মানব ও ভৌত পুঁজি (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যগত পয়নিষ্কাশন, গণ সেবা ইত্যাদি) নির্মাণের সুযোগ খুব কম। এগুলোতে সুযোগ খুব সীমিত বলে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে তারা ক্রমশ বঞ্চিত হচ্ছে। এমনকি সরকারের গৃহীত নিরাপত্তাজাল কর্মসূচি তাদেরকে টেনে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং কী কারণে তা আমরা সবাই জানি। সুতরাং এমন এক দৃশ্যপটে তাদের অব্যাহত চরম দুর্দশার জন্যে বিশ্বায়নকে দায়ী করার অর্থ দাঁড়ায় জনগণের প্রয়োজন পূরণে সরকারের ব্যর্থতা, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। সুতরাং দারিদ্র্যের গুহা থেকে চরম দরিদ্রদের তুলে আনতে হলে দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছাসহ সুচিন্তিত নীতিমালা ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি গ্রহণ। মোদ্দা কথা, এই গোষ্ঠীর দারিদ্র্য প্রকোপের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব প্রায় অনুপস্থিত; তাদের কষ্টকর জীবিকা খুব কমই বহির্বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত, সেজন্য এদের উপর বিশ্বায়নের প্রতিকূল প্রভাব নেই বললেই চলে।

এ প্রসঙ্গে সম্পদ স্বত্বের কাঠামো ও সুযোগের কাঠামোর মধ্যকার বিরাজমান ব্যবধানের প্রসঙ্গ উলেণ্ঢখ না করলেই নয়। একটা উদাহরণ দিয়ে তা স্পষ্ট করা যেতে পারে। লাতিন আমেরিকার কিছু কিছু দেশ ব্যাপকভাবে অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দেবার পরও খোলা অর্থনীতির ফসল প্রত্যাশিতভাবে তেমনটি ঘরে তুলতে পারছে না। অথচ পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো খোলা অর্থনীতির সুযোগ পেয়ে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাস ঘটিয়েছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলো পারছে না কারণ তাদের আপেক্ষিক সুবিধা নিশ্চিত রয়েছে কেবল অদক্ষ শ্রম-নিবিড় পণ্য উৎপাদনে। অথচ আন্ড়র্জাতিক বাজারে দক্ষ শ্রম-নিবিড় পণ্য ও সেবার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সুতরাং দক্ষ শ্রম-নিবিড় উৎপাদনে দরিদ্রদের প্রবেশগম্যতা যেহেতু কম, সেহেতু এ ধরনের খোলা অর্থনীতি থেকে আসা সুবিধাও তাদের জন্যে কম থাকবারই কথা। বস্তুত দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর সমস্যা হচ্ছে তাদের দেয় সম্পদ স্বত্বের কাঠামো বিরাজমান সুযোগ কাঠামোর সাথে খাপ খায় না। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয় (ওসমানী ২০০৯)।

লক্ষ করা গেছে যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ স্ব-কর্মসংস্থান (নিজের ক্ষুদ্র খামারে অথবা দোকানে কিংবা অ-প্রাতিষ্ঠনিক কোনো ফার্মে) কিংবা মুজরি কর্মে নিযুক্ত। এ ক্ষেত্রে তাদের সামনে প্রধান বাধাগুলো হলো ঋণের অভাব, বাজারজাতকরণ সমস্যা, নতুন প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ সেবার অভাব, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং সুচিন্ড়িত সরকারি নীতিমালার অভাব। সুতরাং এখানে অভ্যন্ড়রীণ নীতিমালার ক্ষেত্রে বৈপণ্ঢবিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। এটা না করে বিশ্বায়নের বির"দ্ধে বিষোদগার করা অর্থহীন। আবার শুধুমাত্র বিদেশী বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের ওপর দোষ চাপালে চলবে না; কেননা অনেক সময় বিদেশী বিনিয়োগ ও ব্যবসা বিভিন্নভাবে এ সমস্ড় সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করে থাকে– যেমন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করা ইত্যাদি (বর্ধন ২০০৫)।

৫.২। ধনাত্বক প্রভাব

বিশ্বায়নের অন্যতম দিক হচ্ছে এই যে, এটা দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নকরণ ভাবনাকে দূর করতে সাহায্য করে। তারা ভাবে, বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি হয়তো তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। বিপরীত দিক থেকে দেখলে মনে হবে, বিশ্বের সাথে বিচ্ছিন্নতাই তাদের দারিদ্র্য সংক্রান্ড় বেদনাদায়ক পরিণতির জন্যে দায়ী। এ সমস্ড় দেশ সাধারণত ভূ-বেষ্টিত (Land-locked) এবং এদের বেশির ভাগই আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। বলা বাহুল্য, বৈশ্বিকরণ বর্তমানে একজন নিম্ন আয়ের মানুষকে জ্ঞান, বিনোদন ও অন্যান্য সেবার ভা"ারে প্রবেশের যে সুযোগ করে দিয়েছে, তা ১০০ বছর পূর্বে একজন বৃহৎ সম্পদশালীর পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব ছিল না।[১] এমনকি বিশ্বায়ন-বিরোধী পক্ষের কার্যক্রমে যোগাযোগের (বিশেষ করে ইন্টারনেট সুযোগের) ভূমিকা অনেক বড় যা আবার বিশ্বায়নের সুবাদে প্রাপ্ত। আবার, ধরা যাক, জ্যামাইকা তার দুগ্ধ বাজার খুলে দিলে দুগ্ধজাত পণ্যের আমদানির ফলে তার স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ড় হতে পারে কিন্তু একই সাথে এই আমদানির ফলে দরিদ্র শিশুদের জন্যে অপেক্ষাকৃত কম দামে দুধ সরবরাহ করা যেতে পারে। এটা আজ অজানা নয় যে, বিশ্বায়িত পৃথিবীর অন্যতম স্ড়ম্ভ বৈদেশিক সাহায্যের ফলে অনেক দেশ উপকৃত হয়েছে (যেমন সেচ,

[১] জন ডি রকফেলারের (১৮৩৯-১৯৩৭) যে সম্পদ ছিল তার বর্তমান মূল্য হবে ২০০ বিলিয়ন ডলার- বর্তমান আমেরিকার শীর্ষ ধনী বিল গেটস এর সম্পদের প্রায় দ্বিগুণ। তা সত্ত্বেও রকফেলারের টেলিভিশন দেখা কিংবা ভিডিও গেমস খেলার সুযোগ ছিল না। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে কথা বলার জন্য টেলিফোনের ব্যবহার ছিল না। আর অসুস্থ হলে এন্টিবায়োটিকসহ আয়ু বর্ধনকারী অনেক ওষুধ সে সময় পাওয়া যেত না। কথায় বলে, বর্তমানের একজন সাধারণ আমেরিকান ১০০ বছর পূর্বেকার শীর্ষ ধনীর চাইতে বেশি ধনী।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পে প্রদত্ত সাহায্যের দ্বারা)। তাছাড়া সংযোগের সুযোগে নতুন বিদেশী কোম্পানির আগমন স্বল্পমেয়াদে সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষতি সাধন করে, কিন্তু প্রযুক্তি-প্রদীপ্ত এ সমস্ড় বিদেশী প্রতিষ্ঠান অর্থনীতির জন্যে যে মঙ্গল বয়ে আনতে পারে সে বিষয়টিও বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন (স্টিগলিটজ ২০০৩)।

প্রযুক্তির প্রসঙ্গে বলতে হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় দুই-তুতীয়াংশ খানায় মুঠোফোন রয়েছে, ২০০৫ সালে যা ছিল মাত্র ১২ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৫৭ শতাংশ খানার মুঠোফোন রয়েছে, যা ২০০৫ সালে ছিল ৬ শতাংশ (বিবিএস ২০১১)। এই মুঠোফোন কীভাবে ও কি কাজে দরিদ্র খানাগুলো ব্যবহার করে সে তথ্য আমাদের হাতে নেই, তবে রিকশা/ভ্যান চালক কিংবা মাটি কাটায় নিয়োজিত শ্রমিকদের যখন মুঠোফোনে কথা বলতে দেখা যায়, তখন অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে বিশ্বায়নের কল্যাণে প্রযুক্তিটি দরিদ্রের দৌরগোড়ায় পৌঁছে গেছে (বক্স ২)। এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বৈশ্বিকরণের ধনাত্বক প্রভাব পড়েছে দরিদ্র পরিবারগুলোর উপর। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভারতের কমলাপুর গ্রামের সয়াবিন চাষী মোহাম্মাদ আরিফ (২৪) মনে করে যে কম্পিউটার আসার ফলে নিজেদের দ্রব্যের উপর চাষীদের নিয়ন্ত্রণ বেড়ে গেছে। অনেক সময় বিশেষ করে গরিব কৃষক বাজারের কারসাজিতে প্রতারিত হয় অথবা বিদ্যমান বাজার দরে দ্রব্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কম্পিউটার আসার ফলে কৃষকরা এখন বাড়িতে বসেই সিদ্ধান্ড় নিতে পারে এবং মূল্যবৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ড় পণ্য ধরে রাখতে পারে। এ সবই বিশ্বায়নের সুফল।

এ যাবৎ বাংলাদেশ ধান গবেষণায় এবং উন্নত ফলনশীল ধান বীজ উদ্ভাবনে যে সফলতা ও খ্যাতি অর্জন করেছে তাকে বিশ্বায়নের ফসল বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। বিশ্বায়নের মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি মেটাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়। বস্তুত বিশ্বায়নের সদর্প ও সরব উপস্থিতিতে ম্যালথাসের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণিত হতে চলেছে। বিভিন্ন আন্ড়র্জাতিক গবেষণা সংস্থার সাথে (যেমন 'ইরি') এ দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগ খাদ্য উৎপাদনে প্রশংসনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে। একদিকে মানব সম্পদ সৃষ্টি ও অন্যদিকে কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ফলে বিশ্বায়ন থেকে বাংলাদেশ লাভবান হচ্ছে। বাংলাদেশে আমদানি উদারীকরণ নীতির ধনাত্বক প্রভাব হচ্ছে অপেক্ষাকৃত সস্ড়া দামে ক্ষুদ্র সেচ যন্ত্র ক্রয়ের সুযোগ। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট চাষকৃত জমির প্রায় চার-পঞ্চমাংশ সেচের আওতাধীন। ১৯৮৮ সালে যেখানে ০.২০ হেক্টর পর্যন্ড় চাষ করে এমন খানার ৩৭ শতাংশ সেচ সুবিধা পেয়েছে, ২০০৮ সালে তা ৮৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে আশির দশকে গৃহীত উদার আমদানিনীতি ও সেচ যন্ত্রাংশ আমদানিতে শুল্ক হ্রাস ও শুল্ক তুলে দেয়ার কারণে। বলাবাহুল্য, সেচ যন্ত্রের পানি খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এবং বর্তমান বাংলাদেশের গরিব চাষীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সেচের মাধ্যমে আধুনিক ধান চাষ করে থাকে (হোসেন ও বায়েস ২০০৯)। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এই গরিব খানাগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

এবার তৈরি পোশাক রপ্তানির কথা ধরা যাক। দেখা গেছে মাথাগণনা সূচক ২০০০-২০০৫ সালে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে ৯ শতাংশ পয়েন্ট। অন্যান্য কিছু বিষয় অপরিবর্তিত রয়েছে ধরে নিলে এই সময় রেমিট্যান্স খাত ও তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি অব্যাহত না থাকলে দারিদ্র্য কমতো ৬.৫ শতাংশ পয়েন্ট।

বক্স ২: মজির"দ্দিনের মুঠোফোন

মজির"দ্দিন (৬০) পাবনা থেকে সাভার এসেছেন শ্রমিকের কাজ করার জন্যে। দৈনিক ১৮০ টাকার বিনিময়ে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব সংলগ্ন পুকুরে মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত। মাটি কাটার কাজ সাধারণত খুব দরিদ্র জনগোষ্ঠী করে। বিশেষ করে মন্দা মৌসুমে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সরকারের নেয়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে এরা কাজ করে। যাহোক, সারাদিন মাটি কাটা শেষে মুঠোফোনে কথা বলতে বলতে মজির"দ্দিন তার ঠিকাদারের কাছে যাচ্ছিলেন সম্ভবত দিন শেষে মজুরি পাবার আশায়। জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, তার মুঠোফোন তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। মুঠোফোনে এই মাত্র জানলেন যে, তার পাঠানো অর্থ বাড়িতে যথাসময়ে পৌঁছেছে। তাছাড়া সাভার এলাকায় যে শ্রমিকের চাহিদা আছে সে খবরটিও তিনি পাবনা থেকে পেয়েছেন তার প্রতিবেশির মুঠোফোনের মাধ্যমে। পাবনাতে তিনি শ্রমিকের কাজই করতেন, তবে জানতেন না যে সাভার অঞ্চলে অর্থ উপার্জনের সুযোগ বেশি। মজিবুদ্দিন এখন বাড়িতে টাকা পাঠান এবং সে টাকা আবার পৌঁছালো কিনা তার খোঁজ নেন মুঠোফোনে।

আহমেদ হোসেনের বাড়ি সিরাজগঞ্জ। নদী ভাঙ্গন কবলিত দরিদ্র পরিবার থেকে আসা আহম্মেদ এখন জাবি ক্যাম্পাসে রিকসা চালান। রিকসায় উঠতেই শুনি এয়ারটেল এর সেই সুরেলা সুর। আমি কিছু ভেবে ওঠার পূর্বেই সে তার লুঙ্গির ভাঁজ থেকে মুঠোফোন বের করে কথা বলা শুর" করে দেয়। জিজ্ঞেস করলাম, কার সাথে কথা বললেন? উত্তর এলো, 'বউকে কইলাম সন্ধ্যায় আইসা বাজার করমু'। আহমেদ হোসেন ক্যাম্পাসের আশেপাশে বাসা নিয়েছেন। দরিদ্র হলেও তার দু'টো মুঠোফোন: একটা নিজে কিনেছেন, অন্যটি শ্বশুর বাড়ির উপহার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত মুঠোফোনের নিম্নগামী মূল্য যেন গরিবদের দুয়ারে এ অমূল্যবান যন্ত্রটি পৌঁছে দিয়েছে বৈশ্বিকরণের উপহারস্বরূপ।

আবার শুধুমাত্র রেমিট্যান্স প্রবাহ ততটা না হলে দারিদ্র্য হ্রাস পেতো ৭.৪ শতাংশ পয়েন্ট। অর্থাৎ বিশ্বায়নের ফলে তৈরি পোশাক রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি দারিদ্র্যের উপর ধনাত্বক প্রভাব ফেলেছে। বিপরীত পক্ষে রেমিট্যান্সজনিত ধাক্কার (Remitance Shock) কারণে, মাথাগণনা সূচকে, দরিদ্রতা ১.৬ শতাংশ এবং তৈরি পোশাক রপ্তানিজনিত ধাক্কায় আরও প্রায় ১ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় (খন্দকার ও রায়হান ২০০৯)। সবচাইতে বড় কথা, তৈরি পোশাক রপ্তানি ও রেমিট্যান্স থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা কেবল দেশে রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে তা নয়, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভলশীরতা হ্রাস করছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কম নয় বরং বেশি বিশ্বায়ন দারিদ্র্যের জন্য ভালো। বিশ্ববাজারে রপ্তানি পণ্যের প্রবেশগম্যতার জন্যে আমরা প্রতিনিয়ত যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি তা অধিকতর বিশ্বায়নের চাহিদারই প্রতিফলন।

বৈশ্বিকরণের ফলে বিভিন্ন খাতে (যেমন, বস্ত্র, জুতা, পুতুল ইত্যাদি) বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে পারে পরোক্ষভাবে। এ ধরনের বিনিয়োগ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে দরিদ্রের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারে (বক্স ৩)। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈদেশিক বিনিয়োগ চার ভাবে দারিদ্র্য স্তরকে প্রভাবিত করতে পারে: কর্মসংস্থান, মানবপুঁজি সঞ্চয়ন, উপচে পড়া জ্ঞান এবং সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি। শ্রম-ঘন শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটলে অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য কমাতে পারে। আবার যদি পুঁজি বা জ্ঞান নির্ভর শিল্পে বিনিয়োগ হয়, তাহলে দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়তেও পারে। অন্যদিকে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে যখন প্রতিষ্ঠানগুলো কর্পোরেট কর দিতে শুর" করবে। সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ হলো, দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক বিনিয়োগ নতুন বিনিয়োগে উৎসাহ দেবে এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎমুখী সংযোগ কর্মসংস্থান ছাড়াও রাজস্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। সেই অতিরিক্ত রাজস্বকে গরিবমুখী প্রকল্পে ব্যবহার করে দারিদ্র্য কমানো যেতে পারে (এডিসন ও মাভরোটাস ২০০৪)। সময়ের বিবর্তনে অপেক্ষাকৃত কম খোলা অর্থনীতির চাইতে অধিকতর বহির্মুখী অর্থনীতিতে মজুরি হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এটা অনস্বীকার্য যে, শ্রম-ঘন পণ্যের জন্যে চীন ও ভিয়েতনাম

বিশ্ববাজারে বেশ শক্ত অবস্থানে আছে, এবং বৈশ্বিকরণ সন্দেহাতীতভাবে ওই দেশগুলোতে দারিদ্র্য কমাতে সাহায্য করছে (বিশ্ব ব্যাংক ২০০২)।

বক্স ৩: বাংলাদেশ : যেখানে বিশ্বায়নের বিকল্প নেই

বাংলাদেশের সামনে জীবনকালে একবার (Once in a life time) একটা সোনালী সুযোগ অপেক্ষা করছে। অতীতের দুর্বলতা ও অদক্ষতা কাটিয়ে ইতিহাসে এই প্রথম ৮-১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের হাতছানি। এই অলৌকিক ঘটনা অবদান রাখতে পারে বেশ কিছু উপাদান, এবং বিশেষত অধিকতর বিশ্বায়ন বা অর্থনৈতিক অখণ্ডতা। শোনা যায়, মজুরি ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধির কারণে চীন এখন শ্রম-নিবিড় পণ্য উৎপাদনে (যেমন, গাড়ি ও মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশ, জুতা, আসবাবপত্র, বস্ত্র, তৈরি পোশাক, খেলনা ইত্যাদি) তার ঐতিহ্যগত আপেক্ষিক সুবিধা হারাতে বসেছে। যদি ধরে নেয়া যায় যে, বাংলাদেশ চীনের ১৮৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক এবং বস্ত্র বাজারের (বিশ্বের মোট সরবরাহের এক-তৃতীয়াংশ) এক-দশমাংশ করায়ত্ত করতে সক্ষম, তাহলে এ অসামান্য সাফল্যের সূত্রে রপ্তানি আয় দ্বিগুণ হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে বর্তমানের ১০-১২ শতাংশের বিপরীতে রপ্তানি বাড়াতে হবে ৩০-৩৫ শতাংশ হারে। বাংলাদেশের প্রধান সুবিধা এই যে, এখানে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম, দৈনিক ১.৫- ২.০ ডলার; ইন্দোনেশিয়ায় এর পরিমাণ প্রায় ৫ ডলার। তাছাড়া প্রতিবেশি দেশ থেকে সস্তায় বিদ্যুৎ আমদানি ও ট্রানজিট থেকে প্রাপ্ত সুবিধা তো আছেই। বাংলাদেশ প্রতি বছর ১০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃজন করে। যদি শ্রম-নিবিড় রপ্তানি পণ্যের প্রসার ঘটে, তা হলে ৩৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং কর্মসংস্থান গুণক ২ ধরলে মোট কর্মসংস্থান দাঁড়াবে ৭০ লাখ। একবার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে সরকারি রাজস্ব বাড়বে এবং অবকাঠামো ও নির্মাণ খাতে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ হবে। গুণক এবং সংযোগ প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশের এমন এক প্রবৃদ্ধির পথে পা পড়বে যা এ দেশের মানুষ কোনো দিন কল্পনাও করেনি। যেমন, বর্তমানে ১০ লাখের পরিবর্তে যদি ৩০ লাখ লোক উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারে, আয়ের বিবেচনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১ শতাংশে, টাকার অংকে যা ১ বিলিয়ন ডলার। ফলে বৃদ্ধি পাবে মজুরি ও হ্রাস পাবে দারিদ্র্য। জনবহুল বাংলাদেশের জন্যে এর কোনো বিকল্প নেই। কেননা লাখ লাখ লোক ভালো কাজ না পেলে শুধু অর্থনৈতিক অপচয় হবে না, নিশ্চিতভাবে দেশকে অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দেবে। পল সেম্যুয়ালসন বলেছেন: সমস্যাটা এমন নয় যে প্রতি জোড়া হাতের সাথে খালি পেট আসে; বরং ওই হাতের সাথে তীক্ষ্ণ কনুই যুক্ত থাকে। যাহোক, মাত্র ২ বছরে ৩৫ লাখ কর্মসংস্থান গুণক প্রভাবের (গুণক ২ ধরে) মাধ্যমে ৭০ লাখ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। মোটামুটিভাবে, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে এবং শ্রম-নিবিড় ম্যানুফেকচারিং খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের পর্যাপ্ত প্রবাহ দারিদ্র্য হ্রাসে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। এবং এ ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

উৎস: G. Papanek (2010): *Bangladesh Labor Force and Foreign Private Investment-Major Asset or Bigger Problems.*? A keynote presentation Organized by the Bangladesh Board of Investment (BOI) and Policy Research Institute (PRI), April.

৫.৩। ঋণাত্মক প্রভাব

বিশ্বায়ন যে আবার বেদনাদায়ক হয়ে উঠতে পারে তার বেশ কিছু প্রমাণও পাওয়া যাবে হয়তো। বিশ্বায়নের কুফল দেখতে গিয়ে আমদানি বিকল্প শিল্পে নিয়োজিত দরিদ্র কর্মজীবীদের কথা বলা যেতে পারে যেমন চিনি, বস্ত্র, পাট শিল্পে নিয়োজিত অথবা কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত শ্রমিক। অভ্যন্ড়রীণ বাজার যদি খুলে দেয়া হলে স্বাভাবিকভাবে বিদেশ থেকে আসা অপেক্ষাকৃত সস্ড়া পণ্য অবাধে প্রবেশ করে দেশীয় শিল্পের জন্যে হুমকী হয়ে দাঁড়াবে। এতে কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, শ্রমিক চাকরি হারায় এবং দারিদ্র্যের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। মুক্ত বাণিজ্যের বিপরীতে দেয়া যুক্তিগুলোর অন্যতম প্রধান "শিশু শিল্প" যুক্তিটি প্রধানত অসম প্রতিযোগিতা থেকে দেশীয় শিল্প কারখানাকে রক্ষা করার কথা বলে। তবে এক্ষেত্রে বেশ সতর্কতার সাথে তুলনা করতে হবে। এমনও

হতে পারে যে, বাণিজ্য উদারীকরণের পূর্বেই শিল্প ইউনিটগুলো রুগ্ন ছিল এবং উদারীকরণ সেই অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে মাত্র। আবার এমনও হতে পারে যে, সমস্যাগুলো নিতান্তই সাময়িক, যা দীর্ঘমেয়াদে কাটিয়ে উঠে টিকে থাকা সম্ভব (ইসলাম ২০০৪)। যাহোক, পূর্ব এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার কিছু দেশ বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাবের কারণে আর্থিক সংকটে পতিত হবার কথা অনেকেই শুনেছি, যদিও তার প্রধান কারণ দুর্বল তদারকি ও নিয়মনীতির ফলে সৃষ্ট আর্থিক খাতের গোলযোগ। এক্ষেত্রে বেশি বিশ্বায়নের চাইতে কম বিশ্বায়ন অপেক্ষাকৃত ভালো। প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বৈশ্বিকরণের কারণে অনেক দেশে দারিদ্র্য বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে গরিব দেশগুলোতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি কম থাকায় সেসব দেশে প্রভাব ঋণাত্বক হতে পারে।

আগেই উলেণ্ডখ করা হয়েছে যে, অপেক্ষাকৃত উদার বা খোলা অর্থনীতির প্রেক্ষিতে দরিদ্র দেশের দারিদ্র্যের মাত্রা কমতে শুরু করছে। অন্যদিকে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিয়ে যে অভিযোগটি উপস্থাপিত হয় তারও কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। বস্তুত ১৯৮০ সালের পূর্বের দশকে বিশ্বে বৈষম্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে তা স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌঁছায়, এবং বর্তমানে কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। শিল্প-পূর্ব পৃথিবীতে যেমন অধিকতর সমতা বিদ্যমান ছিল তেমনি পৃথিবী ছিল অনেক বেশি দরিদ্র। সেই পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া বাস্তবসম্মত নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়।

৬। উপসংহার

বিশ্বায়নের ঢেউ খুবই বিপজ্জনক, আর অর্থনৈতিক আবহাওয়া খারাপ থাকলে সেই ঢেউ আরও বেশি হিংস্র হয়ে উঠে। সোজা কথা, এই ঢেউয়ে সফলতার সাথে সাঁতার কাটা সহজ কাজ নয়। এর জন্যে প্রয়োজন মানব ও ভৌত পুঁজি সৃষ্টিতে বড় আকারের বিনিয়োগ। তাছাড়া বিশ্বায়নের সুফল পেতে হলে বিরাজমান নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় বড় ধরনের ঝাকুনি দেবার দরকার আছে (পিটলাক ২০০৬)। চীন যে এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আগ্রাসী তার প্রধান কারণ মানব পুঁজিতে চীনের প্রাধান্য। বিশ্ববাজার দখলে ভারত বনাম চীন যুদ্ধে চীনের বড় সুবিধা এর উপকরণের উৎপাদনশীলতা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয় (সেন ১৯৯৯)। বাংলাদেশের দরিদ্রের দু:সহ যন্ত্রণার জন্যে যদি কাউকে অভিশাপ দিতে হয় তবে তা বিশ্বায়নকে নয়, দিতে হবে শাসক গোষ্ঠীকে। যারা তাদের জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বায়নের ঢেউয়ে সাঁতার কাটতে হলে দরকার ভালো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা তবে তা কেবল কর অবকাশ ও ভর্তুকি দিয়ে নয়। ভালো ব্যবস্থাপনা মানে দুর্নীতি হ্রাস, যথাযথ বিধিমালা প্রণয়ন এবং সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ। সবশেষে দরিদ্র দেশগুলোর একার পক্ষে এবং বিরাজমান অসম মাঠে খেলতে গেলে সুফল নাও আসতে পারে। ধনী দেশগুলোর উচিত হবে নিজের দেশের বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে না দাঁড়িয়ে উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্রদের পক্ষে কথা বলা (রডরিক ২০০২)। বর্তমান বৈশ্বিকরণ অখণ্ডতা ধরে রাখতে হলে (কিংবা তরান্বিত করতে গেলে) বাণিজ্য বোঝাপড়ার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে হবে আর সে ক্ষেত্রে উন্নয়নগামী দেশগুলোর জন্যে বেশি স্পেস দেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশ্বায়নের বিকল্প আপাতত নেই (বক্স ৩)।

গ্রন্থপঞ্জি

Addison, T. and G. Mavrotas (2004): "Foreign Direct Invesment, Innovative Source of Development Finance and Domestic Resource Mobilization," background paper for Track Global Economic Agenda Helsinki process on Globalization and Democrac, WIDER.

Bhagwati, J. (2004): *In Defense of Globalization,* Oxford.

Bardhan, P. (2004): "The Impact of Globalization on the Poor," Bread Policy Paper No. 003, July.

Bordo, M.D., Barry Eichengreen, and Douglas A. Irwin (1999): *Is Globalization today Really Different than Globalization a Hundred Years,* Combridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Hossain, M. and Abdul Bayes (2009, 2010): *Rural Livelihoods Insights for Banglades*, AH Development Publishing House.

Islam, N, (2004): *Looking Outward-Bangladesh in the World Economy*, The University Press Limited.

Khondker, B.H. and Selim Raihan (2009): "Poverty Impacts of Remittance and Garments: A Computable General Equilibrium Analysis," In: Ambar Narayan and Hossain Zaman (eds.) *Breaking Down Poverty in Bangladesh*, The University Press Limited.

Osmani, S.R. (2009): "When Endowments and opportunities Don't Match," In Tony Addison, David Hulme and Ravi Kambur (eds.), *Poverty Dynamics Interdisciplinary Perspectives,* Oxford University Press.

Pitlak, R. (2006): *Effects of Globalization on the Poor,* University of Texas.

Sen, A. (1999): *Development as Freedom*, Anchor Books.

Stiglitz, J.E. (2003): *Globalization and Its Discontents*, Penguin Books.

Smith, L.C., and Haddad (2000): "Explaining Child Malnutriton in Developing Countries-A Cross-country Analysis," Research Report III.

World Bank (2002): *Globilazation, Growth and Poverty*, World Bank/ Oxford University Press.